উন্নয়ন ও প্রান্তিকতা

বৈষম্যের আকার-প্রকার : ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢোকার অল্প আগে ঝড়ের মতন ওরা এল। এক দঙ্গল। ছেঁড়া, ঢোলা হাফপ্যান্ট। তেল না দেওয়া, অপুষ্টিতে লালচে চুল। খালি গা। আট থেকে বারোর এক ঝাঁক ছেলে। স্টেশনের চা-মুড়ির দোকান থেকে দু-টাকার মুড়ি বেগুনী কিনে, কেউ একা, কেউ ভাগাভাগি করে খেতে বসে গেল। হাপু গানের দল। 'এদের আজকাল এ লাইনের ট্রেনে দেখা যাচ্ছে', সহযাত্রিনী ও বন্ধু বললেন। গানের গলা ফাটা-চেরা, আধা-সুরেলা, কচি। গানও যেমন তেমন, টালিগঞ্জ ও বম্বের ফিল্ম দুনিয়ার চরিত্রদের নামধাম ভরে সেও এক অপূর্ব খিদের দিনলিপি :

আরে, ঘরে নাই আতপ চাল
ছেলে বলে, তাপস পাল।
আরে ঘরে নাই মুড়ি
ছেলে বলে, ওম্ পুরী।

এইভাবে হৃতিক রোশন, করিনা কাপুর, মাধুরী দীক্ষিতদের নামের সঙ্গে ঘরে টানপড়া খাদ্যবস্তুর নামের অন্ত্যমিল! তবে কেবল এ গান কিন্তু ওদের মজুরি দেয় না। গানের সাথে সাথে হাতের লাঠি দিয়ে নির্মমভাবে নিজেদের পিঠে, বাহুতে মেরে অকাতরে যন্ত্রণা সইলে, তবেই গানের পয়সা। ওদের অভ্যেস হয়ে গেছে। হাসতে হাসতে ছেলেগুলি বলে, 'গায়ে ঘা হয়, চামড়া ফেটে রক্ত পড়ে, শুকিয়েও যায়।' আমাদের নিত্যযাত্রীদের সহ্য হয়ে গেছে বোধকরি, নিরুপায় শিশুদের এই ক্ষুধাপীড়িত আত্মনিগ্রহের প্রদর্শন। খোঁজ নিয়ে জানলাম, পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলাসীমান্ত অঞ্চলে ওদের বাস। লোকগানের চল আছে বাড়িতেই, কারণ বাবা-কাকাদের কাছে গান শিখেছে অনেকেই, আবার শ্রোতাদের চাহিদামতো গানের ফেরবদলও করেছে। স্থানীয় গ্রামেগঞ্জে, হাটবাজারে গানের বাজার ছোট হয়ে এসেছে বলে কি ছোটরা বেরিয়ে পড়েছে আগে-কখনো-না-তল্লাশ করা বাজারে? সময়টা নভেম্বরের শেষ। খেতমজুর-ভূমিহীন পরিবারের যথেষ্ট কাজ নেই গ্রামে। বাড়ির ছায়া থেকে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে এসে জোটার পিছনে কর্মহীনতা ও ক্ষুধার এক অকরুণ সমন্বয়। দিনের পর দিন বাড়িতে যায় না, দল বেঁধে প্ল্যাটফর্মে থাকে ওরা। অতএব স্কুল নেই, পুষ্টি নেই, যত্ন নেই, প্ল্যাটফর্মে শিশু-কিশোররা শিকার হয় যৌন নিগ্রহের। তবুও চলছে হাপুগান, আর শরীরে লাঠির মার।

আগের দিন সন্ধ্যার ঘটনা মন থেকে মোছেনি বলেই হয়তো পরের দিনের খবরের

উন্নয়ন
উন্নতি

কাগজে এই খবরটা চোখে পড়ে গিয়েছিল—কলকাতার সম্পত্তির বাজার দর এমন চড়েছে যে বিশেষ বিশেষ অভিজাত অঞ্চলে এক কোটি পঞ্চাশ বা পঁচাত্তর লক্ষ টাকা দামের ফ্ল্যাটও পড়ে থাকছে না। এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকায় কত পরিবারের এক বছরের অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার সংস্থান হয়, তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন মনে আসে। কারা এই সম্পত্তির অধিকারী এবং কীভাবে এতখানি সম্পদের মালিকানা কোনো ব্যক্তির হাতে চলে আসে? যদি কেউ বিপুল ভূসম্পত্তির মালিক হন, সেটা তাঁর ক্ষমতার একটা বাইরের চিহ্ন মাত্র। তলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, এটা হলো আসলে বস্তু বা সেবা উৎপাদনের প্রক্রিয়ার উপর কোনো মানুষ বা গোষ্ঠীর অধিকার। অর্থাৎ কিনা, যিনি সম্পদশালী, তিনি একই সঙ্গে নানা উৎপাদনের উপকরণ, যেমন মানুষের শ্রম, পুঁজি, টেক্‌নোলজির উপরও নিয়ন্ত্রণ রাখেন। এই অধিকার তিনি পারিবারিক সূত্রেও পেতে পারেন অথবা নিজেও অর্জন করে থাকতে পারেন। একটা কথা এখান থেকে স্পষ্ট হচ্ছে—গরিবের ঘরে গরিব জন্মাচ্ছে; ধনীর ঘরে সম্পদশালী। অথবা কেউ যদি অল্প ক্ষমতা থেকে এক প্রজন্মেই বেশি ক্ষমতা অধিকার করতে চায়, আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তাকেও কাগজে কলমে বাধা দেয় না। বৈষম্য কী করে তাহলে তৈরি হচ্ছে? আসলে, গরিবের জন্য সুযোগসুবিধের রাস্তাগুলো এমনভাবে বন্ধ বা রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে, যে এক প্রজন্মের মধ্যে দরিদ্রের পক্ষে কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক হওয়া কার্যত সম্ভব নয়।

একটা দুটো উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে। স্বাধীনতার আগে, জমিজমা আর পুঁজির উপর নানা শ্রেণীর যে নিয়ন্ত্রণ ছিল, দেশ স্বাধীন হবার পরও তার বড় কোনো বদল করা হয়নি। সেরকম কোনো রাজনৈতিক ইচ্ছেই ছিল না। ভূমিসংস্কার হলো না। সম্পদের কোনো পুনর্বন্টন হলো না। চাষের ক্ষেত্রে জমিদারিপ্রথা লোপ পেল, কিন্তু বেনামে চাষ চলতে লাগল। গ্রামাঞ্চলে, শহরে দিনমজুর শ্রেণীর মধ্যে বিপুল দারিদ্র্য। পরে সত্তরের দশকে দারিদ্র্য দূর করার দিকে সরকারের চোখ পড়ল, কিন্তু গরিব যা পেল সে তো ছিটেফোঁটা! পালনের জন্য মুরগি-ছাগল, কিছু কম সুদের কৃষিঋণ, গৃহহীনের জন্য কিছু চালাঘর, ভূমিহীনের জন্য কয়েক ডেসিম্যাল পাথুরে জমি। ধরা যাক একজন দিনমজুরের ছেলে পড়ালেখা শিখে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হবে। প্রথমত তার ঘরে কোনো বইখাতা নেই। কোনো আলো নেই, কারণ গ্রামে এলেও ঘরে তারা বিদ্যুৎ নিতে পারেনি। কেরোসিন রেশনে পাওয়া যায়। রাঁধতেই কুলোয় না, আলো জ্বালবে কী? ধরা যাক, তবু সে পড়তে চলল, স্কুল কোথায়? গ্রামে হয়তো প্রাথমিক স্কুল আছে, কিন্তু সে স্কুল যখন চলে তখন বালক হয় ছাগল চরায় অথবা কাঠপাতা কুড়োতে যায়। গ্রামে মাধ্যমিক স্কুল নেই। পাশের গ্রামে বা তারও পাশের গ্রামে, পায়ে হেঁটে দশ-বারো কিলোমিটার গেলে মাধ্যমিক স্কুল। বালক যতই এগোচ্ছে, তার কাছে পরের গন্তব্যস্থল আরো কঠিন হয়ে উঠছে। কলেজের দোরগোড়ায় যখন সে এসেছে, তখন হয়তো সামান্য রোগে ভুগে বেঘোরে মারা গেল তার বাপ; ছেলে ঘুরেফিরে দিনমজুর অথবা

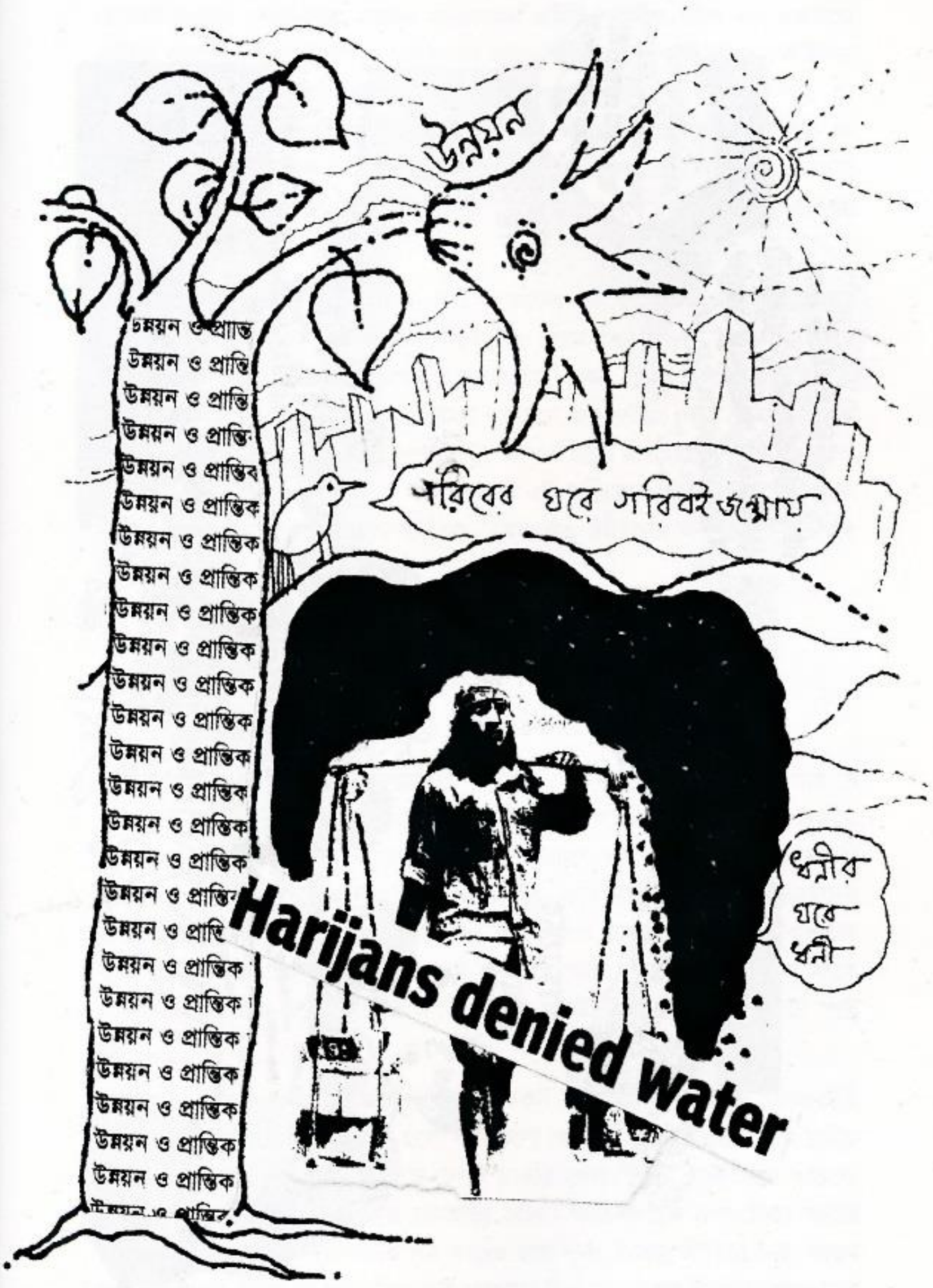
উন্নয়ন
দরিদ্রের ঘরে দারিদ্রই জন্মায়
ধনীর ঘরে ধনী
Harijans denied water
উন্নয়ন ও প্রান্তিক

আমাদের বাড়ি ?
আমাদের স্কুল ?
মাঠ ?
আমার গাছ ?

ছোটখাট চায়ের দোকানদার, নয়তো কারখানার শ্রমিক। অর্থাৎ, হলো না। একজন্মে এইটুকু রাস্তাই পেরোনো গেল। সংবিধানে সমান অধিকারের কথা আছে। আইনত, কোনো বাধা নেই, কিন্তু সুযোগসুবিধের রাস্তাগুলো কার্যত এমনভাবে বন্ধ যে অর্থনৈতিক বৈষম্য চলতেই থাকল। এইরকম বাধা পেরিয়ে কোনো বালক-বালিকা যে সামাজিক বা অর্থনৈতিক উন্নতি করেনি তা নয়। অসাধারণ প্রতিভাবান ব্যতিক্রমরা আছেন। তবে, লাখে একজন এভাবে উঠলে তো আর সাধারণ মানুষের অবস্থা বদলায় না।

আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে, এবং আজকেও বৃদ্ধ বা বালক লোকশিল্পীর গ্রাম ছেড়ে পথে বেরোনো দারিদ্র্যেরই এক নির্ভুল চিহ্ন। গ্রাম যখন সচ্ছল, তখন এঁরা খেয়ে পরে নিজভূমেই থাকেন। গ্রামে যখন অন্নাভাব হয়, তখন বাঁচার শেষ চেষ্টাতেই এঁরা পথে বেরোন। ভূমিহীন নিরন্ন মজুর যেমন পরদেশে জন খাটতে যান, তেমনই এঁদের যাওয়া। কিন্তু ষাট বছর আগে এ দৃশ্যে মানুষ আশ্চর্য হতো না। হয়তো ব্যথিতও হতো না। দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পর মন আর এই দারিদ্র্যের চিহ্নকে স্বাভাবিক বলে মানতে চায় না, কারণ তাহলে অর্থনৈতিক বৈষম্যকেও উন্নয়নের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বলে মেনে নিতে হয়।

দুটি প্রশ্ন এখানে তোলা যেতে পারে—

(১) বৈষম্য কি সত্যিই উন্নয়নের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি?

(২) গত ছ-দশকের উন্নয়নের ভিতর অর্থনৈতিক বৈষম্য কি বেড়েছে?

বৈষম্য কি সত্যিই উন্নয়নের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি : প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে উন্নয়নের প্রক্রিয়া যদি এমন হয় যাতে সমস্ত মানুষের সহযোগ না থাকে, যদি জাতীয় আয়ের একটা বড় অংশ সামাজিক সুরক্ষা ও কল্যাণে ব্যয় না করা যায় এবং যদি উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় দরিদ্রকে সংগঠিত না করা যায়, তবে অর্থনৈতিক বৈষম্য উন্নয়নের সমান্তরাল পথে চলতে থাকবেই। কারণ, ঐতিহাসিক ও সামাজিক নানা প্রতিকূলতার ফলে প্রান্তিক মানুষের অধিকার যেভাবে খর্ব হয়ে আছে, তাকে কেবল নানা খাতে উন্নয়নের জন্য ব্যয় করে প্রসারিত করা যায় না। একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা স্পষ্ট হবে।

ধরা যাক কোনো গ্রামে কৃষিজমি অধিগ্রহণ করল সরকার। গড়ে উঠল বেসরকারি ইস্পাত কারখানা। বিনিয়োগ করা হলো কয়েকশো কোটি টাকা। একহাজার জন স্থানীয় যুবক ও বাইরের কারিগরি দক্ষতার লোক চাকরি পেল। কিন্তু একই সঙ্গে পাঁচশো ছোট-মাঝারি কৃষক ও কৃষিমজুর গ্রামছাড়া হলো। ক্ষতিপূরণের নগদ টাকা অন্যত্র বাড়ি বা জমি কিনতে ব্যয় করার পর তাদের হাত শূন্য; বিকল্প জীবিকা নেই, কারণ তাদের কোনো ট্রেনিং বা অন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল না। এবার ইস্পাত কারখানার